গল্প/গদ্য

অনিন্দ্য সান্যাল

ধার্মিক আমি

নমঃ নারায়ণ। এই বলে সম্বোধন করার কায়দা আমিও রপ্ত করেছিলাম রিখিয়ার আশ্রমে। রিখিয়া দেওঘরের কাছে একটি গ্রাম। সেখানে আমি গিয়েছিলাম এক বন্ধুর সাথে, সে সৎ এবং ধার্মিক ; সে একজন নাট্যকারও বটে। সেই গ্রামে, রিখিয়াতে আমি গিয়েছিলাম কয়েকটি কারণে। প্রথমত, আশ্রমিক জীবন দেখার অভিপ্রায়, দ্বিতীয়টি হল যোগ শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় নিজেকে জারিত করা। আমার বন্ধুটিই সব কিছু ব্যবস্থা করেছিল, তার সাথে ঋষিকেশ এবং হরিদ্বারের বিভিন্ন আশ্রমের সখ্যতার সুবাদে এই সব যোগ শিবিরের খবর সে নিয়মিত পেত। সে আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল এবং আমিও সেই সুযোগ হাতছাড়া হতে দিইনি। সে ই-মেল করে আমাদের দুজনার জন্য নাম বুক করেছিল এবং এই আধ্যাত্মিক, ধার্মিক তথা যৌগিক ট্যুরটা সে পুরোপুরি পরিচালনা করেছিল।

সময়টা ছিল শ্রাবণ মাস। আমরা দেওঘরে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে দেখলাম প্ল্যাটফর্ম গিজগিজ করছে গেরুয়া জামা আর হাফপ্যান্ট পরা বোল বম-এ। সেই ভয়াবহ গেরুয়ার স্রোত ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছোঁয়ার সাথে সাথে যেরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই দেখে আমরা উল্টো দিক দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে লাইন ডিঙিয়ে ওপাশের প্ল্যাটফর্মে উঠলাম। দেওঘর আমাদের আপ্যায়ন করছিল রাস্তা ভর্তি নরবিষ্ঠা নিয়ে, অবশ্য তাতে প্রাণ উপুড় করে ব্লিচিং পাউডার ঢেলে চলাফেরা আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে সেখানকার প্রশাসন। যতদূর মনে পড়ছে আমি একটু আধটু সেই পাউডার মাখা বিষ্ঠা মাড়িয়ে বালিতে মুছে মুছে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম।

যখন আমরা রিখিয়ার আশ্রমে এসে পৌঁছলাম তখন বেলা ঢলে পড়েছে, দ্বাররক্ষীকে বক্তব্য জানাতেই সে আমাদের অফিসে পাঠাল, আমার বন্ধুটি সেই ই-মেল-এর কপিটি দেখিয়ে নামধাম খাতায় নথিভুক্ত করল, তখন আমরা কাগজের প্রিন্ট আউট নিয়েই ঘুরতাম, এমন মোবাইল ফোন যাকে আমরা স্মার্ট বলি তা তো ছিল না, তবে মোবাইল ছিল, আমার সেই কালো ধ্যাবড়া টিপে টিপে চালানো ফোন, ক্যামেরা ট্যামেরা ছিল না। যেহেতু দেওঘর অন্য রাজ্যে, তখনকার ডেটা প্যাকেজ অনুযায়ী আমার রোমিং টোমিং-এরও সুযোগ ছিল না। আপাতত তাই বাড়ির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

আমাদের বলা হল মাইল খানেক দূরে আমাদের থাকার জন্য তাদের হস্টেল রয়েছে। সেখানে জিনিসপত্র রেখে নাওয়া ধোওয়া করে আবার এখানে আসতে হবে যোগশিক্ষা, ভজন কীর্তন এবং দিনের তিনবেলার আহার্যের জন্য। তারা ঘড়ি দেখে বলল, আপলোগ জলদি হো কে আইয়ে কিঁউকি ছে বজে হামারা ডিনার হোতা হ্যায়।

শুনে আমি আমার বন্ধুর দিকে তাকাতে সে বিজ্ঞের মতন বলল, আশ্রমে এরকমই নিয়ম। এখানে কি তুই রাত বারোটা অব্দি মাল খাবি নাকি।

তবু ছ'টায় ডিনার ! কিন্তু প্রথম চমকটা সামলে নিতেই আমার বেশ রোমাঞ্চ হতে লাগল। কারণ এটা আমার কাছে বেশ নতুন একটা ব্যাপার আর আমি তো চাইছিই একটা অন্যরকম জীবন চেখে দেখতে, সেই জীবনের ভিতরে প্রবেশ করতে। আমরা তাড়াহুড়ো করে অটোতে আমাদের ব্যাগ চাপিয়ে হস্টেলে এসে উঠলাম।

দেওঘর যেভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, রিখিয়াতে এসে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম পরিবেশ। পাঁচ সাত কাঠা জায়গা জুড়ে ক্যাম্পাস, তার দু'পাশে মুখোমুখি কয়েকটি বাংলো টাইপের একতলা বাড়ি। কোনো লোকজন দেখতে পেলাম না প্রথমে। আমরা অটোওলাকে ভাড়া দিয়ে ছেড়ে দিয়ে এদিক ওদিক লোকজন খুঁজছি, সে-সময় বাঁ-পাশের বাংলোর বারান্দায় একজন শ্বেতাঙ্গ সাধুকে শুয়ে থাকতে দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। সে আমাদের পায়ের শব্দে অত্যন্ত ধীর এবং শম্বুক ছন্দে গাত্রোত্থান করে আমাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। আমার সেই বন্ধুটির সেসময় সাহেবদের প্রতি বেশ একটা মাখোমাখো ভাব ছিল এবং সে যেহেতু ইংরিজিতে চোস্ত, সাহেবি কায়দায় সে তাকে আমাদের আসার কারণ ব্যক্ত করল। সাধুটি সে-রকমই নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ঢাউস এক খাতা বের করে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, আপকা নাম ঔর পতা লিখ দিজিয়ে। আমরা নাম ঠিকানা লিখে দিতেই সে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে সামনে তাকাতেই আমরা আমাদের পেছনে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। মাথা ঘুরিয়ে যাকে দেখলাম সে আশ্রমের কেয়ারটেকার। সাধুটি বলল, আপলোগ আপনা আপনা রুম দেখ লিজিয়ে। অতঃপর সে আমাদের এখানে থাকার কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা বুঝিয়ে দিল, যেমন এখানে ধূমপান, গুটখা চর্বন নিষিদ্ধ, কোনো আমিষের প্রবেশ নিষিদ্ধ, নিজেদের বিছানা পত্তর নিজেদের গুছিয়ে রাখতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনায় এবং যোগশিবিরে পৌঁছে যেতে হবে এবং একটি যে সাধারণ বাথরুম সেটিকে প্রতিবার ব্যবহারের পর পরিষ্কার করতে হবে। আমরা একটি প্রকাণ্ড ডরমিটরিতে পাশাপাশি দু'টো খাট বেছে নিয়ে বিছানা পাতলাম। বাথরুমে গিয়ে দেখলাম ঝকঝকে তকতকে সে বাথরুম এবং আমিও সেই বাথরুম ব্যবহারের পর ঝকঝকে তকতকে করেই বেরলাম। পরে আমিও আমার বাড়িতে কিছুদিন এই অভ্যাস চালু রেখেছিলাম, কিন্তু জীবনপ্রবাহ পুণরায় জীবিকার্জনের পথে ম্লান হতে হতে সেই অভ্যাসও কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল অচিরেই।

আমরা সেই সাহেব সাধুটির সাথে কিছু কিঞ্চিৎ আলাপও করেছিলাম, যদিও সে বিশেষ প্রকাশ করতে চায়নি। সে ছিল একজন রাশিয়ান এবং বৈরাগ্য তাকে এতদূর টেনে এনেছে। সে বেশিরভাগ সময় আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কী যেন ভাবত।

সন্ধে হতে না হতেই আমাদের ডর্মিটরিতে আরও বেশ কয়েকজন এসে জুটল। সকলেই এসেছে যোগশিবিরে অংশ নিতে। তারা অধিকাংশই বিহার ও ঝাড়খণ্ডের লোক এবং ধর্মের কথা ছাড়া আপাতত তাদের মুখে অন্য কথা নেই। তাদের বেশিরভাগই পঞ্চাশোর্ধ, এমনকি ষাটোর্ধ। খানিক গল্পগাছা করার পর আমরা সকলেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। পরের দিন থেকে আমাদের আশ্রমিক পর্ব শুরু এবং তার সময় ভোর চারটে। সুতরাং যেহেতু কোথাও কোনো ঘড়ি দেখা গেল না এবং কোনো ওয়েক আপ কলের প্রবন্ধ নেই সুতরাং আপন আপন মোবাইলে অ্যালার্ম। রোমিং টোমিং এর পয়সা না থাকলেও শুধু এই ভোরে ডাকার জন্যই আমাদের মোবাইলে মাঝে মাঝে চার্জ দিতে হবে। সন্ধে ছ'টায় ডিনারে চারখান হাতরুটি, খানিকটা ডাল আর ট্যালট্যালে সবজি খেয়ে পেটে প্রথম রাতটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম ভোরের অপেক্ষায়।

আমি ছোটোবেলায় আসন শিখেছিলাম নীলমণি দাসের বই থেকে। তখন ক্লাস নাইন বা টেন, আমার শরীর টিংটিঙে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া বন্ধুবান্ধব বিশেষ না থাকায় বয়সোপার্জিত কিছু উৎকণ্ঠা কিছুদিন আমাকে আরও দুর্বল করে তুলেছিল। ফলে আমাদের ডাইনিং রুম থেকে খাওয়ার টেবিলটা উঠোনে পাঠিয়ে সেটাকে আমার আসন করা ও বইখাতা রাখার রুম করে নিয়েছিলাম। দেয়ালে একটা বিবেকানন্দর ছবি সেলোটেপ চারদিকে দিয়ে সাঁটিয়ে দিয়ে সেদিকে মুখ করে যোগাসন করতাম। ক্রমে আমি পদ্মাসন দিয়ে শুরু করে গোমুখাসনের সহজ গিঁটটা কাটিয়ে শীর্ষাসন, পর্বতাসন, আর্চ ফেলা প্রভৃতি দিব্যি নীলমণি দাস পড়ে পড়ে রপ্ত করে ফেলেছিলাম। শুধু কার্তিককে আসন পেতে দেওয়ার ব্যাপারটাই আর হয়ে ওঠেনি। আর একটা কথা, আমি কিন্তু এই আসন করাই হোক বা আর কিছুই হোক, আজ যেমন তোমরা আমাকে দেখছ তেমন মোটেও ছিলাম না, ঘড়ি ধরে আমার দিন চলত, যদিও তখন ঘড়ি না থাকলেও কারোর কিছু যেত আসত না।

এখন অনেকদিন পর রিখিয়াতে যোগ শিবিরে ভিড়ে গিয়ে আমি আবার সেই যোগাসন করব, শরীরচর্চা করব এইসব ভেবে বেশ খুশী খুশী ছিলাম। কিন্তু প্রথম দিনের যোগের শেষে আমি বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম। আমার তখন ত্রিশ ছুঁই ছুঁই, এদিকে অপরাপর যারাই এসেছে তারা অধিকাংশই বয়স্ক এবং তারা এসেছে কিছুটা ধর্মের টানে, আর নয়তো পেটে গ্যাস না হওয়ার দু চারটে ফ্রী হ্যান্ড শেখার অভিপ্রায়ে। যিনি ট্রেনার, আশ্রমের একজন সিনিয়র সন্ন্যাসী, তিনিও ওই মিনিট কুড়ি কয়েকটা ফ্রী হ্যান্ডই শেখালেন এবং জনগণের নাড়ি বুঝে কয়েকটা শ্লোক সমবেতকণ্ঠে গীত করিয়ে পরবর্তী সূচী বিবৃত করেই বলে দিলেন এবার ব্রেকফাস্টের সময় সমাগত। ভোর ছ'টায় ব্রেকফাস্ট, মানে অর্ধদিবস এ পেটে কিঞ্চিন্মাত্রও খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করেনি যখন তখন দু চারটে রুটি পরম আহ্লাদে ক্ষণিকের মধ্যে জঠরাগ্নিতে সমর্পণ করার তরাসে বেশ একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আমার এখনো মনে আছে, সেদিন রাতভর বৃষ্টি হয়েছিল, অন্ধকারে আমরা ঝুণ্ড বানিয়ে একত্রে গ্রামের মেঠো পথ, খানিকটা জংলা রাস্তা, কারোর কারোর বাড়ির গোয়ালঘর পেরিয়ে আমাদের হস্টেল থেকে মূল আশ্রমে যোগ শিখতে এসেছিলাম। এখন এই যৌগিক অ্যাডভেঞ্চারে আমাদের এক্ষুণি যেটা দরকার সেটা পেটে কিছু দানাপানি, আপাতত তাই শামিয়ানা খাটানো জায়গায় অধিকার বুঝে নেওয়ার কাজ চলছে। এরপর যে কর্মটি ছিল তা ছিল অভাবনীয় এবং প্রথমে রোমাঞ্চ জাগিয়ে যে তা অচিরেই বোঝা হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত।

আমাদের কোথায় খাওয়া দাওয়া করতে হবে, কখন কী কী করতে হবে সেই সমস্ত নির্দেশ দিচ্ছিল কয়েকজন বিদেশিনী। পরে জেনেছিলাম তারা কেউ ফ্রান্সের, কেউ আমেরিকার। এবং তাদের ভিতরে ভিতরে ঈর্ষা ও অন্তর্কলহ এই আশ্রমিক জীবনেও কতটা প্রজ্বলিত তা-ও কিছুটা আঁচ করেছিলাম।

আশ্রমের নিয়ম হল সেবা করা, আশ্রমের প্রতিটি কাজ সহাস্যবদনে নিজ নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করা। প্রথমেই সকল যোগ শরণার্থীকে দু'জন দু'জনের গ্রুপে ভাগ করা হল। আমার বন্ধুটি তার অসামান্য ইংরিজির জোরে সেই আমেরিকান (পরে জেনেছি) মহিলাকে, আমার এখনো তার মুখ মনে আছে, বোঝাতে সক্ষম হল যে আমরা দু'জন কত ভালো জুটি, আমরা দু'জন কী অসামান্য পারদর্শীতায় সমস্ত টাস্ক কমপ্লীট করে ফেলতে পারব। প্রথমে একটি সহজ টাস্ক দিয়ে আমাদের কাজ শুরু হল। সেটি কম্বল, যার ওপর আমরা সকলে আসন করেছি, অনেকে পেদেছেও, যার আওয়াজ ও গন্ধ আমরা দুই বন্ধুই পেয়েছি, সেই সব কম্বল ঝেড়ে উলটে

রোদে শুকোতে দেওয়া এবং পরে ভাঁজ করে আশ্রমের প্রার্থনাকক্ষে যথাস্থানে রেখে দেওয়া। সেই কাজ আমরা দুই বন্ধু বেশ চটজলদি করে ফেলেই সহাস্য বদনে সেই অসামান্য রূপসী সন্ন্যাসিনীকে জানাতেই তিনি প্রফুল্ল হয়ে আমাদের প্রশংসা করলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রার্থনাকক্ষের কাচের জানালাগুলি পরিষ্কার করার কাজে আমাদের লাগিয়ে দিলেন। অবশ্য কীভাবে সেই কাচের শার্সি পরিষ্কার করতে হবে শিখিয়েও দিলেন তিনি। একটা খবরের কাগজ চারভাঁজ করে সেটিতে জলের ছিটে দিয়ে ওপর নিচ এক এক টানে চেপে চেপে টান দিয়ে দিয়ে জানলার কাচ পরিষ্কার করার পদ্ধতি তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। আমি পরে বাড়িতে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলাম, কিন্তু গত তিন বছরে আমার বাড়ির জানালার কাচ বাংলা ইংরিজি কোনও খবরের কাগজেরই সংস্পর্শ পায়নি। এ আমারই ব্যর্থতা বলে আমি মনে করি। আমিই কোথাও অলসতা দোষে দুষ্ট।

তো এই পর্ব চলতে চলতেই দশটা বেজে গেল এবং বাইরে জোর ঘন্টা বেজে উঠল। আমেরিকান সন্ন্যাসিনী ছুটে এসে বললেন, গো অ্যান্ড হ্যাভ ইয়োর লাঞ্চ।

লাঞ্চ ! কলকাতায় এই সময় আমি এখনো অফিসেই ঢুকিনি !

যাহোক সেই একই রকম খাবার, খালি রুটির সাথে সাথে খানিকটা ভাতও পাওয়া গেল। খানিকটা দই সরষের তেলে সাঁৎলানো কারি, যেটা আবার স্পেশাল পদ। আমাদের সাথে এক ফরাসি তরুণের আলাপ হয়েছিল, যে ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলতে পারত। সে দেখলাম একমনে এক কোণে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে একটা রুটি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তার হস্টেল আমাদের প্রেমিসেস-এর ভিতরে হলেও তার রুম ছিল ওপাশের বাংলোতে। মাঝে মাঝে আমরা একসাথে হস্টেলে ফিরতাম। একদিন এইরকম লাঞ্চ করে আমরা হস্টেলে ফেরার পথে কে কোথায় ছিটকে গেল। পরে জেনেছিলাম, আমাদের রুমমেট বুড়োগুলো কোথায় পকোড়ার দোকান আবিষ্কার করে সেখানে পেটের না মেটা আকাঙ্ক্ষা পুরো করতে সটকে পড়েছিল, তাদের মধ্যে আবার বেশ কয়েকজন আশারাম বাপুর শিস্য ছিল, তখন অবশ্য আশারাম তুলসীপত্রের ন্যায় পবিত্র এবং রামদেব নবীন ও উঠতি টিভিকাঁপানো সাধুবিশেষ। আমরা দেখলাম বৃষ্টি বেশ জোর এসেছে। একটা পরিত্যক্ত স্কুলবাড়িতে আমরা কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিলাম। সেই ফরাসী ছেলেটিও আমাদের সাথে কিছুক্ষণ থেকে গেল। কথায় কথায় জানলাম সে ফ্রান্সের কোন এক জায়গায়, কোথায় আজ আর মনে নেই, একজন ইলেক্ট্রনিক্সের শিক্ষক, ছুটিতে ইন্ডিয়া এসেছে। হোয়াই ? সে মৃদু হেসে বলে, তু দু সেভা। পরেরদিন সেবার লাগিয়া তাকে পাব্লিক টয়লেট পরিষ্কার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দুপুরের দিকে আমরা দেখলাম সে ফিনাইল আর ব্রাশ আর ঝাঁটা নিয়ে আশ্রমের পাব্লিক টয়লেট পরিষ্কার করছে। আমরা বললাম, এনজইং ? সে হেসে বলল, সেভা।

৩

আমাদের আশ্রমিক পর্ব শুরু হত ভোর চারটেয়। দল বেঁধে ভোরের শিশির ও দু চারটে তারার ম্রিয়মাণ আলো গায়ে মাখতে মাখতে আমরা হাজির হতাম মূল আশ্রমে। এখানে শুধুমাত্র যোগকক্ষ, প্রার্থনাকক্ষ বা শয়নকক্ষ ছাড়া সর্বত্রই চামড়ার চটি পরে চলাচল অবাধ ছিল। চামড়ার বেল্ট বা ওয়ালেট নিয়েই সর্বত্র যাওয়া যেত যা আমি অনেক মন্দিরে বা আশ্রমে নিষিদ্ধ দেখেছি। যোগ বা সাধনকক্ষে প্রবেশ করে নিজেদেরকেই সারা ঘর

জুড়ে শতরঞ্জি পাততে হত। তারপর নিজ নিজ আসন গ্রহণ করে পদ্মাসনে বসতে হত। প্রত্যেককে মোটামুটি শুয়ে পড়ে শবাসন করার মতন জায়গা ছেড়ে রাখতে হত। শুরুতে থাকত তাদের একটি গুরুবন্দনা, সেই স্তোত্রের সুরের কিছু মোহ ছিল, সারাদিন মাঝে মাঝে সেই সুর ঘুরেফিরে আসত, যদিও কে গুরু কেমন সে গুরু সেসব কিছুই জানতাম না যেমন অনেক বালক না বুঝে স্কুলের প্রার্থনাসঙ্গীতে যোগ দেয়। এরপর আরও কিছু শ্লোক স্তোত্র গীত হত, কী কী তা এতদিন পর আমার আর মনে নেই। তবে হঠাৎ খোল কর্তাল সহকারে হনুমান চালিশা শুরু হতেই প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। এখন ২০১৮ তে বসে আমি যখন এই কথাগুলি লিখছি তখন হিন্দুত্ব হিন্দুত্ববাদী ইত্যাদি শব্দগুলি নতুন করে উঠে এসেছে, সোশাল মিডিয়াতে নানারকম লেখালিখি হচ্ছে, গরু পাচারকারী সন্দেহে বা গরুর মাংস রাখার অপবাদেও মানুষকে পিটিয়ে মারার খবর উঠে আসছে, ধর্ম ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বেড়ে চলেছে ক্রমশ, কিছুদিন আগে নিহত হয়েছেন গৌরী লঙ্কেশ এবং একটা ওপর চালাক ফাঁপা বুদ্ধিজীবিমহল ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে স্ব স্ব আখের গোছাচ্ছে। এখন এমন একটা সময় এসেছে যখন দুর্গাপুজো শুরু হয়ে যায় মহালয়ার দিন থেকে, ক্লাবে ক্লাবে ডোনেশন দেওয়া হয় পুজো উপলক্ষে, নেতা মন্ত্রীদের বড় বড় বিজ্ঞাপনে রাস্তা ঘাট, খবরের কাগজ আলো হয়ে থাকে এবং ভারতবাসী মেতে থাকে তিন তালাক নিয়ে, শবরীমালা মন্দিরে রজঃস্বলা নারীর প্রবেশাধিকার নিয়ে। এখন এই সময়ে ধর্মের পক্ষে এবং ধর্মের বিপক্ষে হাওয়া বইছে তুফানের মতন এবং পূর্বাপর না ভেবে মানুষ তর্ক করছে শুধুমাত্র নিজের অনুকূলে যা কিছু তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার তাগিদে। ফলে হিন্দুত্ববাদবিরোধী নিজের অবস্থানকেও সুস্পষ্ট করার বাসনায় অনেক সময় মানুষ রাজনীতি ও ধর্মকে গুলিয়ে ফেলছে। আমার অন্যতম প্রিয় বার অলিপাব যেখানে আমি বিয়ার ও গোমাংসের একটি বিশেষ পদের লোভে বেশ কয়েকবার গিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও যাব। আমার বাড়িতে কোনোদিন হনুমান চালিশা দূরস্থান পুজো আর্চার পাটও প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু সেই মুহূর্তে হনুমান চালিশার মাধুর্য আমি ছুঁতে পেরেছিলাম এবং পরেও আমি কখনো কখনো হনুমান চালিশা পড়েছি বা শুনেছি। ধর্ম ও তার বিরোধিতার জায়গাগুলি নিয়ে পরে আরো আলোচনা করার ইচ্ছে থাকল, হয়তো কখনো উঠে আসবে আবার, কারণ এই বিষয়ে আমার নিজের অস্পষ্ট ধারণাগুলিও একবার ধোয়াধুয়ি করে নেওয়া দরকার।

তো যাহোক, এইসব হয়ে যাওয়ার পর মিনিট কুড়ি ফ্রী হ্যান্ড, আসন যা আমার মনে লাগত না। তারপর শতরঞ্জি গোটানো, কায়িক শ্রমদান। কোনোদিন আমাদের দোতলা থেকে মেঝে সিঁড়ি এইসব ঝাড়ু দিয়ে মুছতে মুছতে নিচে অব্দি নেমে আসতে হত, কোনোদিন আবার বাগানে একটা রাসমঞ্চ তৈরি হবে বলে ইট বয়ে আনতে হত। আমার মনে আছে প্রথম দিন ঘর মোছার সময় সেই মার্কিন মহিলা যার টুকটুকে লাল ঠোঁট দেখে গাঢ় করে লিপস্টিক লাগিয়েছে বলে সবসময় মনে হত সে আমাদের যত্ন করে মপিং শিখিয়েছিল। ইট বহনের সময় একজনের সাথে আলাপ হল সে আবার ডাক্তার, এখানে সে সন্ন্যাস নিয়ে রয়েছে, আশপাশের গ্রামের দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা করার সাথে সাথে সে আমাদের সাহায্য করছে কায়িক শ্রম দিয়ে, একটা একটা করে ইট ধরে দিচ্ছে সে রোদে ঘেমে ঘাড় থেকে গামছা নামিয়ে ঘাম মুছে। আমাদের প্রত্যেকটা দিন শুরু হত একটাই আতঙ্ক দিয়ে যে, আমাদের ভাগ্যে আর যা-ই পড়ুক পাবলিক টয়লেট পরিষ্কার করার দায়িত্ব যেন না পড়ে। আমার সেই বন্ধুটি কাজ করত আর গজগজ করত, বলত, ওদের ঋষিকেশের আশ্রম মোটেই এরকম না, সেখানে লাইব্রেরী রয়েছে, সেখানে ইচ্ছে মতন দুপুর বেলা বইপত্র পড়া যায়, এখানে খালি কায়িক শ্রমের পার্টটাই দেখছি বেশি। সে ভাবত আমার মতন খাদ্যরসিক মদ্যপায়ী লোক বোধহয় আর সহ্য করতে পারছে না, তাই মাঝে মাঝে সকালের দিকে খানিক ফ্রী থাকার সময় সে বলত, পকোড়া টকোড়া খেয়ে নিতে পারিস বাইরে, চাইলে ডিমের ওমলেট। কিন্তু কেন কে জানে, আমি ঠিক করেছিলাম যখন যেটা করছি তখন সেটা যতটা সম্ভব ঠিকভাবে করাই উচিত। তা ছাড়া সেই সময় আমি মাসে দু-একদিন মদ

খেলেও সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম বছর খানেক এবং প্রায় টানা তিনবছর আমি সিগারেট খাইনি। তাই সিগারেটের অভাববোধও সেখানে ছিল না। আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম এবং কিছুদিনের জন্য একেবারে অন্য এক চরিত্র হয়ে যেতে চাইছিলাম। সামনে ঝুলন, তখন নাকি দলে দলে মানুষ আসবে ওদের আশ্রমে। তার তোড়জোড় চালু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আমাদেরও মোটামুটি এক সপ্তাহ হতে চলল, অফিসেও ওই এক সপ্তাহই ছুটি নিয়ে এসেছি। সুতরাং যে কদিন থাকব আশ্রমের নিয়ম কানুন মেনেই থাকব এবং যেটুকু আমার দেখার, যেটুকু আমার শেখার, যা নেওয়ার নিয়ে নিতে পারলেই আমার এক্সপেরিমেন্টের একটা মানে থাকবে।

যাওয়ার দিন অফিসের রেজিস্টারে চেক আউটের নিয়মকানুন করে আসতে হল, সেই আমেরিকান মহিলা আমাদের বলল, সামনেই তো ঝুলান, তোমরা এখনই চলে যাচ্ছো কেন ? আরো কিছুদিন থেকে যেতে পারতে, আমাদের এখানে ঝুলন খুব বড় উৎসব।

এতদিন থাকা খাওয়া এবং যোগশিক্ষার জন্য কিন্তু কোনো আর্থিক দাবী ছিল না, যে যেমন খুশি অনুদান দিয়ে আসতে পারে। আমি তখন খুব কম মাইনের একজন সেলসম্যান, যতদূর মনে পড়ে দেড়শো বা দু'শো টাকা দিয়েছিলাম।

আবার সেই দেওঘর স্টেশন। এখানকার প্যাঁড়া বিখ্যাত শুনেছিলাম, বাড়ির জন্য নেওয়া হল কিছু। পাটনা হাওড়া জনশতাব্দী আসছিল। দেখলাম আমার বন্ধুবর যার অনুপ্রেরণায় আমি এখানে এসেছিলাম সে বেশ বিধ্বস্ত, তার গলার আওয়াজ বেশ ম্লান এবং সে বলল, দেখ টিটিকে বলে একটা সীট পাওয়া যায় কি না, উঠেই আমি ঘুমোব। সীট পাওয়া গেল এবং সে ট্রেনে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি এই ক'দিনের আমার জমা খরচের হিসেব করতে থাকলাম। প্রাপ্তি কতটুকু বুঝে উঠতে পারছি না। যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধন হয়েছে, ট্রেন যত বাড়ির কাছাকাছি আসতে থাকল ততই আমার খিদে পেতে শুরু করল, আমার পাড়ার মুরগির দোকানটা মনে পড়তে লাগল, সাদা সাদা পাখিগুলোকে কুচ করে কেটে সে যখন ন্যাংটো বাচ্চার মতন রক্তে লাল বালতির জলে চুবিয়ে ধুয়ে নিতে থাকে আমি বলে উঠি, গলা বাদ দেবে, লেগ পিস দেবে। ট্রেন ঝাড়খণ্ডের সীমানা পেরতেই আমার মোবাইলের রোমিং টোমিং আর থাকল না, আমি বউকে ফোন করলাম, বললাম, ফিরছি, কী রান্না করেছ? সে বলল, চিকেন। আমি বন্ধুকে ঠেলা মেরে তুলে দিয়ে বললাম, আজ আমার ওখানে খাবি? চিকেন আর , আর ......

হাওড়ার কাছাকাছি আসতেই আমার মনে আবার অন্য এক পুরনো চেনা হাওয়া উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করল। আমি বেছে বেছে আমার জীবনে কোন কোন অভ্যাসগুলিকে প্রয়োগ করা যায়, প্রয়োগ করা সম্ভব তার একটা তালিকা তৈরি করতে করতে অনুভব করলাম আমার মনের ভিতর সেই পুরনো চেনা বাতাসটি ক্রমে তীব্র হয়ে উঠছে। হাওড়া পৌঁছে আমরা দু'জন বাড়ি ফেরার আগে যেখানে গেলাম তার জাল লাগানো কাউন্টারের বাইরে ঝুলছে বোর্ডে লেখা এফ এল অফ শপ। তো চেনা হাওয়া আমাকে দিয়ে এক বোতল রাম কেনাল, পাঁইট। বন্ধুটি সন্ধেবেলা এল আমাদের বাড়িতে। বেশ খানিক মদ্যপান হল, চিকেন হল। আমার বউ চিনি বড় বড় চিকেন-এর পিস দিতে দিতে বলল, এই তোমরা আশ্রমের জীবন কাটিয়ে এলে ? বাঃ, বেশ।

তবে সময় মানুষকে তার প্রকৃত অবস্থানে ক্রমশ পৌঁছে দেয়। আমি হয়তো ফোকটে কিছুদিন আশ্রমজীবনের একটা ঝলক দেখে এসেছি মাত্র, কিন্তু সেই বন্ধুটি যথার্থই আশ্রমের উপযুক্ত। সে দীক্ষা নিয়েছে, গুরুদেবের

সেবা শুশ্রূষা করে সময়ে সময়ে, আমিষ খাবার কম পছন্দ তার, মদও সে ইদানীং ছেড়ে দিয়েছে। আর আমি ? আমি যে কেমন তা আমার বন্ধুজনেরাই জানে, আর হাড়ে হাড়ে জানে আমার স্ত্রী, চিনি।

আসলে ধার্মিক আমি, আপাতত নিজের অবস্থান ও নিজের প্রকৃত ধর্মকে চিনে নিতে চাইছি বলেই বোধহয় এইসব মনে পড়ে গেল ।

Copyright © 2019 Anindya Sanyal Published 1st Nov, 2019

অনিন্দ্য সান্যাল —'শহর' পত্রিকার সহসম্পাদক, মূলত গদ্যকার। চাকরিসূত্রে ঘুরে বেড়ান নানারাজ্যে, শহরে আর লেখার রসদ যোগাড় করে চলেন। বিলুপ্ত স্মৃতির গন্ধে, মাঝখানের বোতাম।